পদ্মা থেকে বেরিয়ে গৌরী বা গড়াই নদী কুষ্টিয়া জেলা পেরিয়ে ফরিদপুরে এসে নাম নিল মধুমতী। আরো দক্ষিণে সুন্দরবনের কাছে যেয়ে এ নদীরই নাম বলেশ্বর। আমাদের কাহিনি ১৯৭১ সালে গ্রাম-বাংলার মাঝ দিয়ে এ মধুমতী নদীরই সুদীর্ঘ চলার পথের মাঝামাঝি এক অঞ্চল মোল্লারহাটের। নদীর ওপারে গোপালগঞ্জ জেলা, এপারে বাগেরহাট।

মধুমতীর পারে মোল্লারহাটের রসুলপুর গ্রামের মোল্লারা বেশ প্রাচীন বংশই। মোল্লারা ঠিক কবে এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে সে সম্পর্কে এ বংশের প্রবীণদের নিজেদের মধ্যেও কিছুটা ভিন্ন মত রয়েছে। তবে একটা বিষয়ে সবাই মোটামুটি একমত যে পঞ্চদশ শতকে পীর খানজাহান আলী যখন তার বিশাল নৌ-বহর নিয়ে ভৈরব নদ দিয়ে দক্ষিণে এবং আরো দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই বিজয়ী কাফেলার মধ্যে মোল্লাদের পূর্বপুরুষেরাও ছিল। তারপরে কী ভাবে মোল্লা বংশের একটি ধারা খানজাহান আলীর সঙ্গে বাগেরহাটে না থেকে মধুমতীর পারে এই বিল-জল-কাদার রসুলপুর অঞ্চলে নিবাস গড়ল সে ইতিহাস পুরোটা জানা যায়নি। তবে গত কয়েক পুরুষ ধরেই রসুলপুর গাঁয়ে মোল্লারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত। এ বংশের আদি এক পুরুষ সেকান্দার মোল্লা পীর হিসেবে খ্যাত ছিলেন এবং মধুমতীর এপার-ওপার দুপারেই তার বহু মুরিদ ছিল। শোনা যায় বড় পীর হিসেবে খ্যাত সেকান্দর আলীর রুহানি তাকৎ ছিল এবং তিনি পায়ে-হেঁটে মক্কায় যেয়ে হজ্জ করে এসেছিলেন। সেকান্দার মোল্লা খুবই নুরানি পীর ছিলেন এটা লোকে বিশ্বাস করত এবং তাকে নিয়ে আরো কিছু কিংবদন্তির মতো এই গল্পটা খুব প্রচলিত ছিল যে মধুমতীর ওপারে তার মুরিদদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যদি ঘাটে খেয়ানৌকা না থাকত তো পীর সেকান্দার আলী না কি দিব্যি খড়ম পায়ে নদীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে মধুমতী নদী পার হতেন। এটা কেউই স্বচক্ষে দেখিনি বটে তবে সেকালে পীরদের এ ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কেউই তেমন প্রশ্ন তুলত না। মোল্লা বংশের লোকজনেরা বলতে পছন্দ করত যে তারা 'ইয়েমেন' দেশ থেকে এসেছে। তবে ইয়েমেন দেশটা ঠিক কোথায় এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করাটা বৃথা ছিল কারণ দেশটা যে আরবের ঠিক কোন্ জায়গায় সে সম্পর্কে কারোরই তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অধিকাংশ মোল্লা পুরুষেরা ছিল কিছুটা দীর্ঘকায়। হাড়ের গড়নও তাদের বেশ পুষ্ট এবং গায়ের রং গতানুগতিক বাঙালিদের চেয়ে কিছুটা ফর্সা। মোল্লা বংশের পুরুষেরা প্রায় সবাই-ই দাড়ি রাখত। তবে বর্তমানে গ্রামের আর দশটা কৃষক পরিবারের মতোই মোল্লা